আমার কাল আমার চিন্তা
(ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সচিব থেকে পদত্যাগ)
শাহ আবদুল হান্নান

মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)

আমার চাকরি জীবনের একটি বড় ঘটনা হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করার সঙ্গে জড়িত হওয়া। সেই সাথে এটাকে এদেশে পুরোপুরি কার্যকর করা বা প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলাদেশে কর ব্যবস্থা যে গতানুগতিক হয়ে গেছে তা আমরা গত শতাব্দীর আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই উপলব্ধি করতে পারি। সেই ট্যাক্স ব্যবস্থা, বেশ পুরোনো। তাতে আধুনিকতার ছাপ লাগেনি। বিশ্বে কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের কর ব্যবস্থায় তার প্রতিফলন ঘটেনি। সেসব কারণেই কর ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজানো প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবা হচ্ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংকের একটি টীম একটি স্টাডি করে। তার রিপোর্ট তারা ১৯৮৬-৮৭ সালে উপস্থাপন করে। সে রিপোর্টের সবচেয়ে বড় সুপারিশ ছিল এক্সসাইজ ডিউটি ও সেলস ট্যাক্স যেটা ছিল তার পরিবর্তে ভ্যালু এডেড ট্যাক্স বা মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তন করা। তাদের সাজেশন ছিল, এই করকে প্রথম পর্যায়ে ম্যানুফেকচারিং লেবেল পর্যন্ত করা। অর্থাৎ ইমপোর্টের উপর ভ্যাট হবে এবং ম্যানুফেকচারিং এর উপর ভ্যাট হবে। এটাকে পরবর্তী কোনো এক সময় রিটেইল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি তখন এনবিআর এর মেম্বার, কাস্টমস ছিলাম। কিন্তু সে সময় অন্য কতগুলো কারণে আমি বদলি হয়ে যাই বোর্ডের এক্সসাইজ সাইডে। আমার বদলির পিছনে কারণ ছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের কানে আমার ব্যাপারে তার এক নিকট আত্মীয় নানা কথা তোলে। যতটুকু আমি জানি এবং বুঝতে পারি তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবর্তনটি হয়। পরিবর্তনটি আমারই বন্ধু এস এম আকরাম আর আমার মাঝে হয়। আমি তার জায়গায় যাই এবং সে আমার জায়গায় আসে। আমি আগেই বলেছি আকরাম সাহেব আমার ক্লাসমেট এবং নিকটতম বন্ধু। তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। এর ফল হলো আমি এক্সসাইজ সাইডের দায়িত্ব পেলাম এবং এই পরিবর্তনের কারণেই মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এর মতো ঐতিহাসিক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। দেখা গেল আমার বিরুদ্ধে ১৯৮৭ সালের সেই ঘটনা আমার জন্য ভালোই হলো।

যাই হোক, আমি এর ফলে এ বিষয়ে স্টাডি করলাম। কিন্তু সত্যিই স্টাডি করার পরও কিছুই বুঝতে পারলাম না। মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই হলো না। তখন আমাদের একটা টিম করা হলো, এতে আমরা ভ্যাট সম্পর্কে জানতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দেখে আসব। সেই মোতাবেক তখনকার এনবিআর এর চেয়ারম্যান, ড. একরাম হোসেন, এনবিআর এর প্রথম সচিব জাহিদ হোসেন, আইএমএফএর একজন প্রতিনিধি, আমি এবং প্রাইভেট সেক্টরের চারজন ব্যবসায়ী প্রতিনিধি বাছাই করা হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার বন্ধু মরহুম এম এ কামাল। এ সফরে প্রথমে আমরা ভারতে যাই। ভারতে একটা মোডিফাইড ভ্যাট ব্যবস্থা আছে। তবে সেটা মূলত ভ্যাট নয়। বুঝলাম সেটা এক্সসাইজ ডিউটির সামান্য অদল-বদল। সেখান থেকে যাই ফিলিপাইনে। সেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্যাট কার্যকর করা হয়েছে একদম রিটেল পর্যায় পর্যন্ত। তাদের ভালোমন্দ দেখলাম। সেখান থেকে ইন্দোনেশিয়া গেলাম। ইন্দোনেশিয়াতে হোলসেল পর্যায় পর্যন্ত ভ্যাট সিস্টেম করা হয়েছে। সেখানে তাদের মন্ত্রী মারী মোহাম্মদের সঙ্গে আমার কথা হয়। তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন, আপনারা আর যাই করেন হোলসেল পর্যায় পর্যন্ত যাবেন না। হয় রিটেল পর্যায় পর্যন্ত যাবেন না হয় ম্যানুফেকচারিং পর্যায় পর্যন্ত থাকবেন। এটা একটা মূল্যবান পরামর্শ ছিল। কেননা কোনটা হোলসেল আর কোনটা রিটেইল সেল তা পার্থক্য করা খুব কঠিন হয়। এরপর ইন্দোনেশিয়া থেকে আমরা থাইল্যান্ড যাই। থাইল্যান্ড তখন ভ্যাট এর জন্য তৈরি হচ্ছে। ভ্যাট তখনও কার্যকর করেনি। ভ্যাট নিয়ে তাদের প্রস্তুতি দেখে দেশে ফিরে আসলাম।

এই সফরে আমার মূল উদ্দেশ্যের পাশাপাশি আমি আরেকটি বিষয় ভালো করে খেয়াল করি সেটা হলো, বিভিন্ন দেশের টিভি প্রোগ্রাম। এর মাধ্যমে আমি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় পরিস্থিতি লক্ষ্য করি। ভারতে হিন্দু ধর্মের যে

উত্থান হচ্ছিল তাতে দেখলাম সে উত্থান প্রধানত নেগেটিভ দিকে চলে গেছে। সেখানে মূর্তিপূজার ব্যাপকতা লক্ষ্য করলাম একটা সভ্য জাতির মধ্যে। আরেকটা বিষয় দেখলাম এন্টি-মুসলিম সেন্টিমেন্ট। অথচ হিন্দু ধর্মের কোনো পজেটিভ বিষয়ের উপর জোর দেয়া হচ্ছে তা আমি পেলাম না। এ দুটি জিনিস আমাকে ব্যাথিত করল। যদি আমি ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে হিন্দু জাতির উত্থান লক্ষ্য করতাম তাহলে আমি খুশি হতাম। মানবতার জন্য যে কোনো অধার্মিকতার চেয়ে ধার্মিকতা ভালো। ফিলিপাইন প্রধানত একটি ক্যাথলিক দেশ। তাদের টিভিতে খৃস্টধর্মের মৌল আলোচনা খুব কম দেখলাম। তাদের ওখানে ঈসা (আ) এর ব্যাপারে বলা হচ্ছে, তোমরা যদি বিশ্বাস কর তাহলে সব কিছু সমাধান হয়ে যাবে, মুক্তি পাবে- এই একটা কথাই বারবার বলা হচ্ছে। সৃষ্টিকর্তা, খৃস্টধর্মের শিক্ষায় আলোচনা বাদ দিয়ে সেখানে জিসাস কেন্দ্রিক আলোচনাই বেশি। এতে আমি বেশ হতাশ হলাম এই জন্য যে, আমি ভাবছিলাম খৃস্টধর্মের ভিত্তিতে মানবসমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব কিনা। তখন আমার মনে এই সন্দেহ জাগে যে, এটাই যদি পদ্ধতি হয় তাহলে তা অসম্ভব।

এদিকে ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম অবস্থাও আমাকে হতাশ করল। সেখানকার রাস্তাঘাটে, হোটেলে অনেক মূর্তি দেখলাম। এটা আমার কাছে অবাকই লাগল। সেখানকার লোকেরা ভালোই আরবি জানে। হোটেলের বয় বেয়ারাও আরবি জানে। শপিং সেন্টারগুলোতে দেখলাম ফ্লোরে ফ্লোরেই নামাজের ব্যবস্থা। ছেলেমেয়ে উভয়ে সেখানে নামাজ পড়ে। এমনকি যোহরের সময় মসজিদেও দেখলাম অর্ধেক মেয়ে। এটা আমার কাছে অবাকই লাগল। আজ থেকে তা অনেক আগের কথা। তাতে সেখানে ইসলামের একটি পুনরুত্থান লক্ষ্য করা যায়। তার আগে ইসলামের শক্তিকে দুর্বল করার জন্য সুহার্তোর আমলে বহুদিন পর্যন্ত নির্যাতন চলেছে। সেখানে মুসলিম শক্তি নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছে। তারপরও আমার মনে হয় নানা কারণে গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষের দিকে ইসলামী শক্তির পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। তারই ফলাফল স্বরূপ দেখা যায় গত পার্লামেন্ট নির্বাচনে, যেটা সেদেশের প্রথম অবাধ নির্বাচন, তাতে তিনটি ইসলামিক দল চলে এসেছে এবং তাদের সংখ্যা পার্লামেন্টে প্রায় অর্ধেক।

থাইল্যান্ডে বৌদ্ধ পূজা এবং রাজার প্রশংসা দেখা যায় খুব। রাজার প্রশংসা বলতে রাজাকেন্দ্রিক রাজাপূজাই বলা যায়। আর বৌদ্ধ পূজা তো বৌদ্ধমূর্তি কেন্দ্রিক। যেই বুদ্ধ চেয়েছিলেন মূর্তিপূজা দূর করতে সেই বুদ্ধই হয়ে গেছেন মূর্তি এবং তারই পূজা হয়ে গেছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান দিক। এসব ছিল দীর্ঘ সফরে সেই সব সমাজকে বোঝার একটা দিক। সেসব দেশে আমি প্রায়ই সর্বত্রই পাশ্চাত্যকরণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করলাম। বোঝাই যায় সবখানেই ব্যাপক পাশ্চাত্যকরণ হয়েছে। এরই মধ্যে মুসলিমরা তুলনামূলকভাবে পাশ্চাত্যকরণকে প্রতিহত করেছে বলে মনে হলো।

সফর শেষ করে দেশে এসে আমরা একটি রিপোর্ট তৈরি করি। তাতে মূল বিষয়ে আমরা কিভাবে সামনের দিকে আগাবো তা নির্ধারণ করা হয়। এর জন্য শুরুর পর্যায় আমাদেরকে আইনগত ধারা তৈরির কাজ করতে হয়। যেহেতু আমারই দায়িত্ব তাই আমি ও ড. জাহিদ হোসেন মিলে সেটা শুরু করলাম এবং আইনের মোটামুটি একটি খসড়া তৈরি করে ফেললাম। সেটা করেছিলাম ইংরেজিতে। আইন পাস করার আগে তা আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হয়। তার আগেই কথা উঠল এই আইন ইংরেজিতে করা যাবে না। করতে হবে বাংলাতে। তখন আবার নতুন করে আইনটা বাংলায় তৈরি করতে হলো। সেই কাজে আমি তখন প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ গাজী শামসুর রাহমানের সাহায্য নিয়েছিলাম। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক গভীর হয় আমি যখন এন্টি করাপশনের ডিজি ছিলাম সে সময়। প্রকৃতপক্ষে তখনই আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। তার সাথে আমার সম্পর্ক শুরু হয় একটি বিতর্কের মধ্যে দিয়ে আর সেখান থেকে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তার সাথে দেশ, ইসলামের বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হতো। এতে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি, যেটা আল্লাহর রহমত ছাড়া বিশেষ কিছু নয় যে, তিনি যে কোনো বিষয়ে আমার কাছে সর্বশেষ একটা মতামত নেয়ার চেষ্টা করতেন এবং আমি যেটা দিতাম তিনি সাধারণত তা মেনে নিতেন।

আমাদের খসড়া আইন অদলবদল হয়ে এক পর্যায়ে আইন মন্ত্রণালয় থেকে আবার আমাদের কাছে ফেরত আসে। আমরা সেটাকে আবার ঘষামাজা করে দাঁড় করালাম। যেহেতু এটা একটি নতুন জিনিস ছিল, আইন মন্ত্রণালয়ও তা বুঝত না বলে শত শত প্রশ্ন করত। সে সময় সেসব প্রশ্ন খুব গভীরভাবে বোঝার মতো লোক এই দেশে খুব কম ছিল। আইএমএফ-এর বিশেষজ্ঞ ড. হাসান মনসুর ও আমি দু'জনে মিলে আমরা একটা সমাধানে পৌঁছার চেষ্টা করতাম এবং সেগুলো আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পর তারা সেটাকে গুছিয়ে একটা আইন তৈরি করত।

ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল মন্ত্রী পরিষদকে বোঝাবার চেষ্টা করা। সেটা তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এম এ মুনীমকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। তিনি আবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের নিয়ে একটি মিটিং ডাকলেন। তিনি সহ আমরা তাদেরকে তা বোঝাবার চেষ্টা করি এবং আমি বলব তাদেরকে আমরা মোটামুটি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম। তারা স্বাভাবিকভাবে ভ্যাট সম্পর্কে সব সময় সন্দেহে ভুগতেন না জানি আমরা ভালো করতে গিয়ে আরো কিছু খারাপ করে ফেলি। এ ভীতি সবার মধ্যে ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা সিদ্ধান্ত নেই ১৯৯২ সালের বাজেটে এটা কার্যকর করব। এর আগের বাজেটেই মুনীম সাহেব আগামী বছরের বাজেটে ভ্যাট ব্যবস্থা কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

যেহেতু এটা কার্যকর করতে সময়ের প্রয়োজন তাই খালেদা জিয়ার সরকার আসার পরপরই এই সমস্ত প্রস্তাব নিয়ে আমরা মন্ত্রীসভায় পেশ করি। সেখানে অনেক কষ্টের পরে আমরা মন্ত্রীসভার অনুমোদন পাই। তাদেরও একই কথা, সেই সন্দেহ যে আমরা নতুন মন্ত্রীসভায় এসেছি, না জানি ভালো করতে গিয়ে তা আরো মন্দ হয়ে যায়। আবার ভালোভাবে কার্যকর করা যাবে কি না - এসব বিষয় ছিল। সেই কেবিনেটে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাধ্যমতো চেষ্টা করেন বিষয়টি সবাইকে বোঝাবার জন্য। আমার যিনি সেক্রেটারি ছিলেন নূরুল হোসেন খান তিনি চেষ্টা করেন। আমি চেষ্টা করি। সেই কেবিনেট মিটিং বঙ্গভবনে হয়েছিল। তাতে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিন আহমদ সভাপতিত্ব করছিলেন। তখনও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ছিল। সেখানে প্রবল বিতর্কের পর ভ্যাট ব্যবস্থা পাস হয়। অর্থমন্ত্রীর যুক্তি ছিল এটা না করলে আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হবে। দ্বিতীয়ত, এটা না করলে আরো বেশি করে বিক্রয় কর আরোপ করতে হবে যা সবার আরো অপছন্দ হবে। আর তা হবে রাজনৈতিকভাবে আরো কঠিন।

শেষ পর্যন্ত আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ৯১ সালের ১ জুন থেকে তা কার্যকর করব। তবে এর জন্য আগেই যারা উৎপাদন করে, যারা ব্যবসায়ী, আমদানী করে তাদের রেজিস্ট্রির একটা ব্যাপার আছে। তার জন্য দেশব্যাপী আমরা রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করলাম। সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে তার ব্যবস্থা করা হলো যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, এটাও একটা জটিল ব্যাপার ছিল। অন্যদিকে অফিসারদের একটা বিরাট অংশও ভ্যাট বুঝতে পারছিল না। তারা এর পক্ষে ছিল। তাদের বোঝানো, সম্মত করাও একটা কঠিন কাজ ছিল। সেটাও আমাদেরকে করতে হয়েছে। দেশব্যাপী ঘুরে ঘুরে, ঢাকায় ডেকে এনে তাদেরকে বোঝাতে হয়েছে। তাদেরকে নতুন করে ট্রেনিং দিতে হয়েছে। এখানে আইনের একটি ধারা ছিল ভ্যাট কার্যকর করতে কোন কোন ধারা আগে কার্যকর করতে হবে। সেই ধারাগুলো আমরা আগে কার্যকর করে ফেলি।

ভ্যাট কার্যকর শুরু হওয়ার পরই স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে নানা জটিলতা দেখা দেয় এবং ব্যবসায়ি, শিল্পপতিরা প্রায়ই বিদ্রোহ করে বসল। তারা এটা চায় না। যদিও তারা এর সঙ্গে জড়িত ছিল। এফবিসিসিআই জড়িত ছিল। কিন্তু তারা বলল, আমরা এর জন্য তাদেরকে যথেষ্ট সময় দেইনি। অথচ ভ্যাট এসময় কার্যকর করার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল।

অর্ডিন্যান্স করে ভ্যাট আইন করা হয়েছিল। নিয়ম হচ্ছে পার্লামেন্ট থাকলে ৯০ দিনের মধ্যে তা আইনে পরিণত করতে হবে। ফলে পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্য সাবমিট করা হলো। এ বিলের বিরোধীতা করে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ সকল বিরোধী দল ওয়াক আউট করে। এদিকে কুটিরশিল্প মালিকেরা ঢাকায় প্রায় বিদ্রোহ করে বসে। ঢাকায় তাদের শত শত প্রতিনিধি এই আইন প্রত্যাহারের বিভিন্ন দাবি নিয়ে জড়ো হতে থাকেন। ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি উঠল। এরকম একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ভ্যাটকে রক্ষা করাও একটি কঠিন সংগ্রামে পরিণত হলো। তখন সাইফুর রহমান সাহেবের অনুরোধে সকল ব্যবসায়ী, চেম্বার প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে বসতে হলো। একেবারে শেষে আমি সহ কয়েকজন মন্ত্রী ও সেক্রেটারির উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে বৈঠক হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজেও ঠিক কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। শেষে আমি কথা বললাম। প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি বললাম, ম্যাডাম, আমার মনে হয় আমি যেহেতু ছাত্র রাজনীতি করেছি, আমি বুঝতে পারছি আপনার চিন্তাটা কি? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটা খুবই ভালো একটি সিস্টেম। এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, আগের সরকার এটা কার্যকর করার কথা দিয়েছে আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে। আবার গত বাজেটেই বলা হয়েছে এবার এটা কার্যকর করা হবে। আর এটা একটি উত্তম পদ্ধতি। যেসব সমস্যা হচ্ছে তা সাময়িক।

তারপরও আমি আপনার চিন্তা বুঝতে পারছি। এর জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি, যেখানে খুব বেশি সমস্যা সে কয়টা জায়গা থেকে আমরা এটা প্রত্যাহার করে নিতে পারি। আপনি বললে আমরা দেখে দেখে ৭/৮টি আইটেম থেকে কিছু সময়ের জন্য ভ্যাট প্রত্যাহার করে নেব। তাহলেই গোটা সিস্টেম রক্ষা পাবে।

কেন জানি তিনি আমার কথায় রাজি হয়ে গেলেন এবং তিনি সাইফুর রহমান সাহেবকে আমার উপর দায়িত্ব দিতে বলে দিলেন। তখন আমি কিছু সেনসেটিভ আইটেম বেছে বেছে তার উপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের জন্য পেশ করার পর পরের রাতেই পার্লামেন্টে তা পাস হয়ে যায় সকল বিরোধী দলের ওয়াক আউটের মধ্যেই। এর ফলে ভ্যাট রক্ষা পেল। আর ভ্যাট রক্ষা পাওয়ায় তা যে ভালো হয়েছে সেটা লোকেরা আজকে বুঝতে পেরেছে।

ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয়টি আরো পরিস্কার করার জন্য সে সময় সাংবাদিক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের উপস্থাপনায় একটি টিভি প্রোগ্রামে আমি অংশ নেই। সেখানে আমি দুই দুইবার জাতীয় বিতর্কে শরিক হই। আমি যতটুকু উপলব্ধি করি তাতে আমি সেখানে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলাম। আমার বন্ধুদের মতে আমি সে বিতর্কে জিতেছিলাম। বাকি আল্লাহ জানেন।

ভ্যাট সিস্টিমে আমরা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিলাম। এখানে আগের এক্সসাইজ আমরা বহাল রাখলাম। যেমন, আমরা দেখলাম নিউজপ্রিন্ট, বিড়ির মতো কিছু আইটেম আমরা ভ্যাটে আনতে পারবো না। এগুলোতে করলে তার দাম এত বেশি বেড়ে যাবে যা সাধারণ মানুষের উপর পড়বে। যেহেতু সমস্ত পরিকল্পনা ও চিন্তাভাবনা আমার ছিল, আর আমি তা করতে বাধ্য হয়েছি, সেখানে মূল সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হয় বলে সেখানে আমরা কিছু এক্সসাইজ ট্যাক্স রেখে দিলাম, শুধু সেল ট্যাক্স বাতিল করলাম। ভ্যাটে সবকিছুই আসবে শুধু এক্সসাইজ আইটেম বাদ দিয়ে। যখন আমরা এক্সসাইজ ট্যাক্স তুলে ফেলব তখন তা ভ্যাটে চলে আসবে। এটা একটা মেজর সিদ্ধান্ত ছিল। এটা আমি করেছিলাম। আমি মনে করি বাংলাদেশের বাস্তবতাকে সামনে রেখে একটা ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

ভ্যাটে আরেকটি বিষয় ছিল সেটা হলো, আগে আদায় করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে জমা দেয়া হবে। এটা বিশ্বব্যাপী অনেকখানেই স্বীকৃত। কিন্তু আমরা এটাকে নিলাম না। আমাদের দেশে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া একটা বড় অভ্যাস। সেই জন্য কারেন্ট একাউন্ট রাখার কথা বলা হলো। এখানে পরে এডজাস্টমেন্টের কথা বলা হয়। অর্থাৎ টাকা আগেই পেয়ে যাচ্ছিল। এই পরিবর্তন আমরা বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে সামনে রেখে করেছিলাম। এটা অত্যন্ত জরুরী ছিল। না করলে আমাদের পক্ষে ভ্যাট কালেকশন খুব কঠিন হতো।

তৃতীয় যে বিষয়টি আমি নিজ দায়িত্ব নিয়ে করেছিলাম সেটা হলো সবাই হাইরেট অর্থাৎ ১৫.৫০% না করার পক্ষে ছিল কিন্তু সেটা আমি করেছিলাম। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইআফএমও ১০%-১২% করার পক্ষে ছিল। কিন্তু আমি দেখলাম আমরা নতুন সিস্টেমে যাচ্ছি, যদি কোনো কারণে তা ফ্লপ করে, দ্বিতীয়ত আমাদের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও খুব কম তা যদি বাড়াতে হয় তাহলে আমাদের এখানে ভ্যাটের রেট বাড়াতে হবে। আমরা বারবার বাড়াতে পারব না। যা করার একবারেই করে ফেলতে হবে। এই ভিত্তিতে আমি ১৫% করে ফেলি। যার কারণে আন্দোলন আরো তীব্র হয়। তবে কোনো দেশে ৫% আবার কোনো দেশে ৩০% আছে। কিন্তু আমাদের শুরুই করতে হয় একটু বেশি রেট নিয়ে। ভ্যাট রেট আসলে প্রয়োজন মতো বাড়াতে হয়। আমাদের প্রবর্তিত নতুন ব্যবস্থাটি কতটুকু ঠিক ছিল না ছিল সে হিসাব নিশ্চয় বিতর্কমূলক। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে আমি বলব, এটা করার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তা কল্যাণকর হয়েছে। শুধু এই কারণেই হতে পাও়ে, ৯১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমরা ২০/৩০ হাজার কোটি টাকা বেশি ট্যাক্স পেয়েছি এবং তা শুধু ১২% এর পরিবর্তে ১৫% করায়। সবই সরকার করে, অনুমোদন সরকারকেই করতে হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তটি ছিল মূলত আমার। ট্যাক্স শিল্পপতিরা দেয়নি, দিয়েছে দেশের জনগণ এবং তা প্রকৃতপক্ষে ব্যয়ও হয়েছে দেশের জনগণের জন্যই। সুতরাং জনগণই এর বেনিফিট পেয়েছে। এর জন্য সিস্টেম বানাতে এবং দেশের জন্য কার্যকর করতে আমাদের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করতে হয়েছে।

যাই হোক ভ্যাট টিকে গেলো। ভ্যাট প্রবর্তনের সময়টা ছিল আমার জীবনে বড় ধরনের একটা পরিশ্রমের সময়। দুই তিন বছর এর জন্য আমাকে অবিশ্রান্ত খাটতে হয়েছে। এর জন্য খুব একটা সহযোগিতা পাইনি। শিল্পপতি,

রাজনীতিবীদ, ব্যবসায়ীদের পাস কাটিয়ে এটা এই জন্যই করেছি যে, আমি এটা জাতির জন্য কল্যাণকর মনে করেছি। শুরুতে ভালো সিস্টেমকে লোকেরা অনেক সময় বুঝতে পারে না। আর জনগণ তো জেনে বিরোধীতা করে না। তাদের তো এই বিষয়টি জানা ছিল না। এতে সার্বিকভাবে একদিকে কিছু রেট বেড়ে ১৫% হয়েছে আবার অন্যদিকে কিছু রেট কমে ১৫% হয়েছে। এটার ব্যাখ্যা এরকম যে, মাটি যদি উঁচু-নিচু থাকে তাহলে উঁচু স্থানের মাটি নিচে আনলাম আর নিচের স্থান উঁচু করে সমান করলাম।

সরকারের সচিব থেকে পদত্যাগ

বিএনপি আমলেই সেক্রেটারি হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলাম। তখন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে আমি যথেষ্ট সক্রিয় করার চেষ্টা করি এবং এর জন্য অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করি। সেখানে একটি গতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করি। তারপর হঠাৎ করেই আমাকে ব্যাংকিং ডিভিশনে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা ঘটে আওয়ামী লীগ আমলে। তখন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ছিলেন মোজাম্মেল হক সাহেব। কিবরিয়া সাহেব ছিলেন অর্থমন্ত্রী। কিবরিয়া সাহেব আমার কোনো এক বন্ধুর আগ্রহের কারণেই চাইতেন আমি অর্থমন্ত্রণালয়ে বা ব্যাংকিং ডিভিশনের দায়িত্বে থাকি। তিনি কিবরিয়া সাহেবের সাথে আলাপ করেন এবং কিবরিয়া সাহেব আমাকে দেখা করতে অনুরোধ করেন। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে জানান, আপনাকে তো আমি ব্যাংকিং ডিভিশনে আনতে চাই। আপনি ব্যাংকিং সমস্যা কি কি বলে মনে করেন? সেই সাথে তিনি অর্থনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নও করেছিলেন। এটিই উনার সাথে আমার প্রথম পরিচয়। সেদিন সেই আলাপচারিতার শেষে তিনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন, দেখেন বিগত সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের লোকেরা ব্যাংকিং-এ তো সুযোগ পায়নি, আপনি কি তাদের দিকে খেয়াল রাখতে পারবেন? এ ধরনের প্রশ্ন তিনি আমাকে করায় আমি তাকে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলাম। বললাম, সার, এ ধরনের কথা সত্য নয়। Banking community like any other Community is equally divided. ব্যাংকের যারা মালিক তাদের মধ্যে বিএনপির যেমন লোক আছে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিরও তেমনি লোক আছে। প্রকৃতপক্ষে বিশেষভাবে বঞ্চিত হয়েছে একথা বলা ঠিক হবে না। এখানে আপনার ধারণা আমার মতে সঠিক নয়। তবে আমি বিশেষভাবে কোনো পার্টির জন্য কিছু করতে পারব না। নিয়মনীতির মধ্যে থেকেই সব কিছু করব।

কিছুদিন পরই ব্যাংকিং বিভাগে জয়েন করার আদেশ হয়ে গেল। এতে আমার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ডাঃ মোজাম্মেল হক সাহেব খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি আমাকে বিশেষভাবে ভালোবাসতেন। তিনি নামাজী লোক ছিলেন। তার সম্পর্কে যে যাই বলুক না কেন সেটা তো আমি জানি না। তার সাথে মাত্র তিন মাস কাজ করেছি। এতেই তিনি আমাকে পছন্দ করতেন। আমার উপরে তার আস্থা ছিল। আমার বদলির আদেশ শুনে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলাপ করেন। বলেন, আপনি হান্নান সাহেবকে কেন নিয়ে যাচ্ছেন? আপনি কি এজন্যই তাকে নিয়ে যাচ্ছেন যে তিনি জামায়াতে ইসলামীর লোক? হান্নান সাহেব তো আমার জন্যে খুব ভালো ছিল। তিনি নিজে একথাগুলো মিটিং এ বলেছিলেন। সেখান থেকেই আমি জানতে পেরেছি। তিনি সেটা আমার সামনেই বলেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে আমার সচিবকে নিয়ে যাচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর লোক বলেই কি? কিন্তু আমি উনাকে একজন ভালো সচিব বলে মনে করি। আমি তাকে রাখতে চাই। আমাকে না বলে উনাকে নেয়া আপনার ঠিক হয়নি। আমি জামায়াতে ইসলামীর হই বা না হই এটাই আমার সম্পর্কে তার ধারণা ছিল। প্রাইম মিনিস্টার তাকে বোঝালেন - না না, এটা উদ্দেশ্য নয়। ব্যাংকিং সেক্টরে তার মতো যোগ্য লোকের দরকার। এটা এ জন্যেই করা। এটা তার বিরুদ্ধেও নয়, আপনার বিপক্ষেও নয়।

আমি ব্যাংকিং বিভাগে জয়েন করলাম। সেখানে সাধ্যমতো ভালো কাজ করার চেষ্টা করলাম। যে কাজগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকতে করেছিলাম, যে কাজগুলো বাকি ছিল সেগুলো এখানে গোছানোর চেষ্টা করলাম। আমার চাকরি জীবনের নানা অভিজ্ঞতাই আছে। এখানে তার দুটি কথা বলে রাখা ভালো। আমার এক পুরানো বন্ধু, সচিব - তিনি আমার সিনিয়র হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিলেন যে আমি তার কাজগুলো করে দেব। এটা অন্যায় কিছু নয়। সিনিয়ররা এরকম ভাবতেই তো পারেন। কিন্তু তিনি কি করলেন? তিনি একটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন। গান-বাজনা পছন্দ করতেন। মন্ত্রী এবং আমার কাছে রিপোর্ট আসল যে তিনি বেশ কিছু গাড়ি কিনেছেন। খুব হাই প্রাইস। এগুলো কেনার ক্ষমতা মূলত তাদের নেই। তিনি অফিসেই তার কবি বন্ধু, সাহিত্যিক, গায়কদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এমনকি গানের আড্ডাও বসাতেন। হতে পারে যত না ঘটে তার চেয়ে বেশি রটে। এসব রিপোর্ট আমার কাছে

আসত। অন্যদিকে তিনি আমাকে অনুরোধ করতেন এটা করে দিতে, ওটা করে দিতে। কিন্তু আমি সেগুলো করতে পারছিলাম না। আমি করিনি। এ বিষয়গুলো সামনে আসার পরে তা আমি কিবরিয়া সাহেবের নজরে আনতে বাধ্য হই যাতে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ হয়। আমার এখন ঠিক মনে নেই আমরা কি পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। কিন্তু এর ফলে তিনি আমার উপর ভীষণ ক্ষেপে যান। তিনি বুঝতে পারেন যে আমি তার কথা শুনছি না। বাস্তবে এসব বিষয়ে তার কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আরেকজন মন্ত্রী হয়েছিলেন সিভিল সার্ভিস থেকে। তিনি একজন শক্তশালী সচিব ছিলেন। ক্ষমতাধর মন্ত্রীও হয়ে গিয়েছিলেন। আমার ধারণা ছিল তিনি অনেক ভালো লোক, মন্দ লোক নন। কিন্তু আমি অভিজ্ঞতায় যেটা পেলাম সেটা হলো তিনি যে কয়টা তদবীর করেছেন সব কয়টাই বাজে তদবীর, মন্দ তদবীর, ভুল তদবীর, অন্যায় তদবীর।

এ সময় একটা খারাপ ঘটনা ঘটে যায়। স্টক মার্কেটে আমার সময়ই ধ্বস নামে। এগুলো হয়েছিল দুষ্ট কিছু স্টক মার্কেট অপারেটরের জন্য। যদিও পরবর্তীতে কিবরিয়া সাহেবের দোষ দেয়া হয়েছে। আমি জানি কিবরিয়া সাহেবের কোনো দোষ এ ক্ষেত্রে নেই। এটা আমি বলতে পারি, তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। আমিও তাকে সর্বাত্মক সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলাম। আসলে, শেয়ার বাজার পরিচালনা যারা করে তারা খুব সাংঘাতিক ধরনের কতগুলো বাজে কাজ করে গোটা স্টক মার্কেটে ধ্বস নামিয়ে দেয়। আরেক দিকে আগে থেকেই স্টক মার্কেটের নিয়মকানুনে কিছু ত্রুটি ছিল।

এর কিছুদিন পরে আমাকে আবার আভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, এনবিআর-এ নিয়ে যাওয়া হলো। আমি এনবিআর এ যেতে চাইতাম না। যদিও আমি সেখানকার কালেক্টর, ফার্স্ট সেক্রেটারি, সদস্য সবই ছিলাম। তবুও এনবিআরকে ভয় পেতাম। এর পূর্ণ দায়িত্ব নিতে চাইতাম না বলে কিবরিয়া সাহেবকে বললাম, আমি এর দায়িত্ব নিতে চাই না। কিন্তু তিনি জবাবে বললেন, প্রাইম মিনিস্টার তো আপনাকে এনবিআরএ চাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারছিলাম বিভিন্ন শিল্পপতি গ্রুপ থেকে দাবি উঠছিল এনবিআরএ আমি গেলে ভালো হবে। কারণ তাদের ধারণা সে সম্পর্কে আমার জ্ঞান ভালো আছে। আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমি সেখানে অসৎ কিছু করব না। ভালো কিছু করব। এরকমই ধারণা সমাজে, বিভিন্ন মহলে রয়েছে। কিন্তু আমি ভাবতাম এখানে দুর্নীতি খুব বেশি। কাস্টমসে, ইনকাম ট্যাক্সে দুর্নীতিসহ আরো অনেক বিষয়ে মিলিয়ে আমি মনে করতাম এটা আমার জন্য ভালো জায়গা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে এনবিআর-এ যেতে হলো। কিবরিয়া সাহেব আমাকে কথা দিয়েছিলেন তিনি এটা বাতিল করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু একটা পর্যায়ে তিনি বললেন, আমি পারিনি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে আপনাকে চলে যেতে হবে।

এনবিআর এর চেয়ারম্যান হিসেবে বছর দেড়েকের মতো ছিলাম। সেখানে ১৯৯৭ সালের বাজেট তৈরি করি। প্রত্যেক বাজেটেই কিছু না কিছু ভালো দিক আছে। ঐ বাজেটে যে ভালো কাজ হয়েছিল তা হচ্ছে আজকে আমরা ঢাকায় যে ট্যাক্সিক্যাব (Taxicab) সার্ভিস দেখছি তা সে বাজেটের মাধ্যমেই হয়েছিল। এর আগে আশির দশকে ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস চালুর চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা বাধাগ্রস্ত হয় বলে তখন সরকার মনে করেছিল যে সেটা করা আর ঠিক হবে না। কিন্তু আমি এটাকে কার্যকর করার জন্য সরকারকে রাজি করালাম। আমি নিজেও মনে করতাম এবং সরকারকেও বোঝালাম যে এটা হওয়ার দরকার। পৃথিবীতে এমন কোনো বড় সিটি নাই যেখানে ট্যাক্সি সার্ভিস নাই। ঢাকায় বর্তমানে এক কোটি লোকের বাস। এখানে ট্যাক্সি সার্ভিস হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এই ট্যাক্সিক্যাব এর সুবিধাদি সম্পর্কে কিছু ব্যবসায়ী আমাকে বুঝিয়েছিলেন। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এদের মধ্যে লুৎফর রহমান সাহেব নামে ফরিদপুরের এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আমাকে অনেক বোঝালেন। কেন দরকার? কি করতে হবে? কি কি না করলে এটা হবে না? ইত্যাদি। সেগুলো আমি মোটামুটি আত্মস্থ করলাম। আরো অন্য লোকদের সাথে আলাপ করলাম। ঠিক করলাম এটাকে খুব বেশি সুবিধা দিতে হবে। বেশি সুবিধা না দিলে এটা বাস্তবে কাজ করবে না। আমি কিবরিয়া সাহেবকে রাজি করালাম। তিনি এটা বাদ দেয়ারই পক্ষে ছিলেন। পরে প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়ে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। বর্তমান ঢাকায় ট্যাক্সি সার্ভিস নামে যা আছে তা সেই বাজেটেরই অবদান।

ঐ বাজেটে আমি আইটি সেক্টরের দিকেও বিশেষ নজর দেই। তাদের অনেক দাবি ছিল। আইটি সংক্রান্ত অনেক বিষয় আমি নিজেও ভালো করে বুঝতে পারছিলাম না। তাদের বিষয়গুলো আগে ভালো করে শোনাও হচ্ছিল না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জামিলুর রেজা চৌধুরীও আমাকে বোঝান। ফলে সর্বোচ্চ সুবিধা যেটা

আমাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব ছিল বলে মনে করেছি তা দিয়েছি। সেখানে কর ১০ ভাগ করা হয়। পরের বাজেটে তা শূন্য হয়ে যায়। ফলে তারা আরো ভালো করতে পেরেছে। আইটি সেক্টরের ব্রেক থ্রো হয় ১৯৯৭ এর বাজেটে। আমার ধারণা মোটামুটি একটা ভালো বাজেট পেশ করতে পারলাম।

বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা সাধারণত প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও এনবিআর এর চেয়ারম্যানের মধ্যে হয়। অর্থ সচিবকে রাখা হয় না। কিন্তু ঐ বছর অর্থ সচিব ড. আকবর আলী খান সাহেবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু আমি উনাকে রাখা নিরাপদ মনে করলাম। তিনি যোগ্য ব্যক্তি। আমার বন্ধু মানুষ। তিনি অত্যন্ত ভালো একজন অফিসার। তাকে রাখা ভালোই হয়েছিল।

বাজেট মিটিং হচ্ছিল একটি ছোট রুমে। প্রধানমন্ত্রীকে আইটেম বাই আইটেম আমাকে বোঝাতে হয়। প্রধানমন্ত্রীকে আমি অনেক বেশি বোঝাতাম, বিশেষ করে যেগুলো খুব সেনসেটিভ বিষয় ছিল। সেখানে একবার কিবরিয়া সাহেব বলেন, হান্নান সাহেব, এত বোঝাতে চাচ্ছেন কেন? বিষয়টা তো পরিষ্কারই আছে। তখন প্রাইম মিনিস্টার আমাকে সমর্থন করে বলছেন, না না, ঠিকই আছে। হান্নান সাহেব মনে করছেন বিষয়টি সেনসেটিভ - একথা বলে তিনি আমাকে সমর্থন জানালেন। প্রধানমন্ত্রী আমকে ভালো জানতেন। তার সাথে আমার সুসম্পর্ক ছিল। ফলে তিনি বুঝতেন যে, যে কোনো জিনিস করার আগে তিনি যেন ভালোভাবে বিষয়টি বুঝে নেন এটা আমি চাই।

মিটিং হচ্ছিল গণভবনে যেখানে প্রধানমন্ত্রী থাকেন। দুপুরে খাবার সময় অন্য আরো কিছু লোক খাবারে যোগ দেন। খাবার টেবিলে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। একজন প্রতিমন্ত্রী যার কথা একটু আগেই বলেছি, সিভিল সার্ভিস থেকে এসেছেন, ডাক সাইটে। তিনি হঠাৎ করে একটি কথা বলে ফেললেন। সেখানে আমরা পনের-বিশ জনের মতো উপস্থিত ছিলাম। প্রাইম মিনিস্টার হেড অব দ্যা টেবিল। তিনি বললেন, মাওলানা মওদূদী মদ খেতেন। এ কথাটা বলা হয়েছিল আসলে আমাকে লক্ষ্য করে। ফলে আমি একটু চুপ থেকে মনে করলাম যে এটা বিনা প্রতিবাদে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। তখন কিছুটা উচ্চ গলায় আমি তাকে বললাম যে, আপনি যদি এ কথা আমাকে দুঃখ দেয়ার জন্য বলে থাকেন তাহলে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। তবে আপনি জেনে রাখুন আমি মাওলানা মওদূদীর ছাত্র। তিনি আমার শিক্ষক। এবং আমি জানি তিনি মদ খেতেন না। সবাই থ হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

আরেকটা ঘটনা খাবার টেবিলে ঘটল। শুক্রবার ছুটি না রবিবার ছুটি এসব নিয়ে কথা হচ্ছিল। আধুনিক সমাজের অবস্থা যা হয়, কয়েকজন রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি দেবার জন্য বলতে লাগল। আর এক পক্ষে আমি একা। তবে অনেকেই চুপ ছিলেন। শেষের দিকে আমি প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি তাদের কথা শুনবেন না। যদি শোনেন তাহলে আপনি ডুববেন। এটা জনমত নয়। এটা জনমতের বিরুদ্ধে যাবে। আরো বললাম, শুক্রবার করার ফলে এ পর্যন্ত রপ্তানির এক বিন্দুও ক্ষতি হয়নি, একটি কনসাইনমেন্টও বাতিল হয়নি। আমদানি-রপ্তানিতে কোনো সমস্যা হয়নি। কাজেই এগুলো শুধু প্রপাগান্ডা। পাশ্চাত্য অনুকরণ ছাড়া কিছুই না। তিনি একটু চুপ থেকে খানিক্ষণ পর সবার সামনে আমাকে বলেন, হান্নান সাহেব, আমি কি পাগল হয়েছি নাকি? আমি এটা করব না।

শিল্পপতিদের বেশির ভাগই রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি করার পক্ষে ছিল। ট্রেড বডিও পক্ষে ছিল। পত্রিকাগুলোর একটা অংশ ছিল রবিবারের পক্ষে যারা নাকি ইসলামের কোনো কিছুই সহ্য করতে পারে না। তাদের এরকম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। বাইরের কিছু চাপও থাকতে পারে। কিন্তু তারপরও যে শুক্রবার ছুটি বাতিল না হয়ে থেকে গেল, আমি বলব তা প্রথমত শেখ হাসিনার জন্যই হয়েছে। আবার নতুন করে বিএনপি ক্ষমতায় আসল তখনও শুক্রবার পরিবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেটাও যে থেমে গেল, আমি বলব তা শেষ পর্যন্ত খালেদা জিয়ার জন্যই। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া উভয়ই বুঝতে পেরেছিলেন এটা জনমতের বিরুদ্ধে যাবে। শেখ হাসিনা পারসিভ করলেন না। এটা জনমতের বিরুদ্ধে হবে। এতে কোনো কল্যাণ নাই। শুক্রবার থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যে কোনো ক্ষতি নাই।

বাজেট হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাজেটের পরে একটি ঘটনা আমার বিরুদ্ধে গেল। সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রেভিনিউ আদায়ের গতি কমে হয়ে গেল আগের বছরের তুলনায়। আগের বছরও আমি ছিলাম। দেশী, আন্তর্জাতিক নানা কারণে এটা হয়েছিল। এটাকে শত চেষ্টা করেও আমরা রিকভার করতে পারছিলাম না। সেটা সরকারের একটা উদ্বেগের

কারণ ছিল। আমাকে সরকার এর জন্যে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে পারে। এটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই আমাকে সরকারের সচিব থেকে পদত্যাগ করতে হয়। একজন মন্ত্রী আমাকে কতগুলো কাজ নিয়ে চাপ দিচ্ছিলেন। আমি সেটা করতে পারছিলাম না। স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্টদের সাথে আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটছিল। তিনি পুরনো বন্ধু, বয়সে আমার জুনিয়র। আমাকে ভালোই জানতেন। কিন্তু যেহেতু তার কথাগুলো অন্যায় বলে আমি রাখতে পারছিলাম না সেজন্য তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

এর মধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটল। জনৈক শিল্পপতির বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির মাধ্যমে আমাকে আদেশ দেন। তখন আমি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে জানালাম এই তদন্ত আমার জন্য জটিলতা সৃষ্টি করবে। সেই শিল্পপতির বন্ধু হলেন একজন ক্ষমতাধর মন্ত্রী যার কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। তখন তিনি আমাকে উত্তরে বললেন, হান্নান সাহেব, এটা আপনি করেন। প্রাইম মিনিষ্টার নিজে যেহেতু বলেছেন আপনার অন্য কিছু দেখার দরকারটা কি? তখন আমি তাকে জানালাম, ঠিক আছে আমি করব কিন্তু একটু ধীরে যাব।

ধীরে যাবার সিদ্ধান্তই নিলাম। সিনিয়র অফিসারদের সাথে পরামর্শ করলাম। তারাও আমাকে ধীরে অগ্রসর হতেই পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পনের বিশ দিনের মধ্যেই তদন্তের বিষয়টি সেই মন্ত্রী জেনে গেলেন। শিল্পপতিও মন্ত্রীর কাছে হাজির হলেন। মন্ত্রী টেলিফোনে আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেন। তখনই ভাবলাম, আমি বুঝতে পারছি আমি আর এই সরকারের সাথে থাকতে পরব না। আমি মন্ত্রীকে বললাম, আপনারা যা করছেন তাতে আমি আর আপনাদের সাথে থাকতে পারছি না। দুর্ভাগ্যের বিষয় একই সময় প্রাইম মিনিস্টারের আরেক মন্ত্রী আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলেন। তিনি হোমিওপ্যাথী ডাক্তার ছিলেন এবং মন্ত্রী পদ মর্যাদার দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি আরেকটি বিষয়ে খুব খারাপ ব্যাবহার করাতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, না আর থাকা সম্ভব নয়। তখন বিষয়টি আমি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে জানিয়ে দিলাম। তাকে না থাকার কথাও জানালাম। তিনি বয়সে একটু ছোট হলেও আমার বন্ধু। তিনি বললেন, হান্নান ভাই, আপনি পদত্যাগ করবেন না। আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ করে আপনাকে জানাবো। আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে সরাসরি আলাপ করতে পারতাম। কিন্তু করলাম না।

এর মধ্যে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির কাছ থেকে যখন কোনো উত্তর পাচ্ছিলাম না তখন পাঁচ-সাত দিন পর অর্থ সচিব আকবর আলী খানকে বিষয়টি বললাম। তিনি আমার ঘনিষ্ট বন্ধু। তিনি তখন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির সাথে কথা বলেন। তিনি আমাকে না যেতে বললেন। কিন্তু এর মধ্যে আর কি হচ্ছিল জানি না। এক রাতে অর্থমন্ত্রী আমাকে জানালেন, হান্নান সাহেব আপনি যেতে চাচ্ছিলেন, আপনি যেতে পারেন। আমিও আপনার কারণে অনেক আক্রমণের সম্মুখীন। এতে তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তার কলিগদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বলেন, আপনি এরকম লোককে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসিয়েছেন যে আওয়ামী লীগ বিরোধী বা যাকে আওয়ামী লীগ বিরোধী লোক বলে মনে করা হয়। তাকে এরকম স্পর্শকাতর পদে রাখছেন কেন? দোষটা যেন কিবরিয়া সাহেবের। সাথে সাথে আমি মন্ত্রীকে জানালাম, ঠিক আছে, কাল সকালে আমি অফিসে গিয়ে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেব। পরদিন সকালে অফিসে গেলাম। সকল মেম্বারদের ডেকে বললাম, আপনারা সকলেই সকলের নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে নেন। আর আমি একটা লেটার অব রেজিগনেশন পাঠিয়ে দিচ্ছি। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আমি একটি পদত্যাগ পত্র কিবরিয়া সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। লিখলাম, আপনার সাথে গত রাতে আমার টেলিফোন আলাপও হয়েছে, আপনি আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করুন। আমি পরের দিন থেকে আর স্বাভাবিকভাবেই অফিসে যাইনি।

কয়েক দিন পর প্রধানমন্ত্রী আমাকে ডাকলেন। আমার কাছে জানতে চাইলেন, কী হয়েছে সব বলেন? আমি তাকে সব খুলে বললাম। এতে তিনি দুই মন্ত্রীর উপরে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। আমাকে বললেন, আমি তো এসব কিছুই জানি না। আপনি থেকে যান। আমাকে শুধু বলা হয়েছে বাজেট খারাপ হচ্ছে এখন চেঞ্জ করলেই ভালো হয়। আর কিছু আমাকে বলা হয়নি। তখন আমি ভাবলাম, ঠিক আছে, হতে পারে। আমি তাকে জানালাম, এখন পত্র-পত্রিকায় অনেক কথা চলে এসেছে। কাজেই থেকে যাওয়া ঠিক হবে না। তিনি তখন বলেন, ঠিক আছে আপনি আপনার টার্ম পর্যন্ত ওএসডি হিসেবে থাকবেন। এর মধ্যে স্বাভাবিক সকল সুযোগ-সুবিধা ঠিক মতোই পাবেন। আপনি এপ্রিল পর্যন্ত থাকেন, যে পর্যন্ত আপনার টার্ম আছে। আমি সেটা মেনে নিলাম। চেয়ারম্যান, এনবিআর থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি হিসেবে বাকি সময়টা কাটালাম।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে সেদিন আমার অনেক আলাপ হয়। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমার পরামর্শ চান। আমি তাকে কিছু পরামর্শ দেই। এর মধ্যে একটি ছিল এনবিআর এর চেয়ারম্যান কার হওয়া উচিত। আমি তখন আবদুল মুয়ীত চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করি। তিনি তাই করেছিলেন। আরেকটা পরামর্শ ছিল ট্রানজিট নিয়ে তাড়াহুড়ো না করা। শেষ পর্যন্ত এটা তিনি আর করেননি। একেবারে শেষে তিনি আমাকে বলেছিলেন, হান্নান সাহেব, আপনার যখনই কোনো পরামর্শ থাকবে আমাকে দিবেন।

আমি তাকে আরেকটি পরামর্শ দিয়েছিলাম। বলেছিলাম আপনার যে পার্টি তা ঠিকই আছে। কিন্তু পার্টিতে ইসলামকে আত্মস্থ করেন। তিনি হেসে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার পার্টি ইসলামের খুব কাছেই আছে। তখন আমি বলেছিলাম, ইসলামকে আরেকটু আত্মস্থ করলে এ জাতির কাছে আপনার জন্য তা আরো বেশি ফেভারেবল হবে। ভালো হবে। আপনি তো ঈমানদার মেয়ে। তিনি হাসতে থাকেন।

যাওয়ার সময় তিনি সুন্দর আলাপ করেন। আমাকে খাওয়ান।